২য় অধ্যায় : ১ম অংশ

এলাম আমরা কোথা থেকে?

বন্যা আহমেদ

দ্বি তী য় অ ধ্যা য়

বিবর্তনে প্রাণের স্পন্দন

গত সংখ্যার পর

খটকা যে লাগছিল না তা তো নয়। সব কিছুতেই গরমিল, চোখ মেলে একটু বৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা করতে গেলেই কোথায় যেন গণ্ডগোল বেঁধে যাচ্ছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রকৃতিবিদ, বিজ্ঞানী এবং ভূ-তত্ত্ববিদরা বারবারই যেনও হোঁচট খেয়ে পড়ছিলেন চারপাশের অসংখ্য পরিচিত এবং অপরিচিত প্রাণের সমাহারকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। মহান এই সৃষ্টির মধ্যে এত অনাসৃষ্টি কেন, কেন এত অযথা অপচয়, কেন দেখলে মনে হয় এর পেছনে আদৌ কোনও পরিকল্পনা বা প্ল্যান নেই? অবস্থাটা দাঁড়াল অনেকটা কুয়োর ব্যাঙের মতো, কুয়ো থেকে বের না হলে তো আর বাইরের পৃথিবীর নতুন নতুন জিনিসগুলো পরখ করে দেখা যাচ্ছে না, আবার কুয়ো থেকে বের হওয়ার পথটাও যে কেউ বাতলে দিচ্ছে না। ভূ-তাত্ত্বিক পরীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে আমাদের এই পৃথিবীর বয়স বহু কোটি বছরের কম নয়, (বিজ্ঞানীরা তখনও জানতেন না পৃথিবীর আসল বয়স কত, পৃথিবীর বয়স হিসাব করে বের করার মতো প্রযুক্তি তখনও তাদের হাতে ছিল না, কিন্তু ভূ-তত্ত্বের বিভিন্ন স্তর এবং ফসিল দেখে বুঝতে পারছিলেন যে এর বয়স বহু কোটি বছরের কম নয়। ১৯০৫ সালে রেডিওমেট্রিক ডেটিং আবিষ্কৃত হওয়ার পরও বেশ পরে বিজ্ঞানীরা হিসাব করে বের করেন যে, পৃথিবীর বয়স আসলে প্রায় সাড়ে চারশ' কোটি বছর) ফসিলগুলোও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে জীবজগতের সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশের ইতিহাস! কিন্তু বাইবেল বলছে, মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে সৃষ্টি করা হয়েছে সব গ্রহ, তারা, নক্ষত্রসহ আমাদের এই পৃথিবী, প্রকৃতিতে বিরাজমান সব প্রাণ একটি একটি করে সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টিকর্তার হাতে, আর তারপর তারা সেভাবেই রয়ে গেছে, বদলায়নি একটুও, আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তারা থেকে যাবে অপরিবর্তনীয়! এই শাশ্বত স্থায়িত্বের তত্ত্ব যেন সিন্দাবাদের ভূতের মতোই ঘাড়ে চেপে বসেছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে কোপার্নিকাস মানুষের কল্পনায় তৈরি স্থির পৃথিবীকে সূর্যের চারদিকে ঘুরিয়ে দিলেন, ব্রুনোকে আগুনে পুড়তে হলো এই ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর তত্ত্বকে সমর্থন করার জন্য। কিন্তু প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞান ঘুরপাক খেতে থাকল সেই কাল্পনিক কয়েক হাজার বছরের অপরিবর্তনশীল এবং স্থবির প্রাণের আবর্তের ভেতরেই।

কিন্তু সেই প্রাচীনকালেই কি গ্রীক দার্শনিকদের মনে সন্দেহ জাগেনি প্রজাতির স্থিরতা নিয়ে? তাদের কেউ কেউ তখনই তো প্রস্তাব করেছিলেন যে প্রজাতি আসলে পরিবর্তনশীল, এক প্রজাতি থেকেই হয়তো আরেক প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে! তাহলে তারপর কি হলো? খ্রিস্টীয় ধর্মের অন্ধকূপে

বামন মানুষের সম্ভাব্য প্রতিকৃতি (National Geographic থেকে নেয়া)

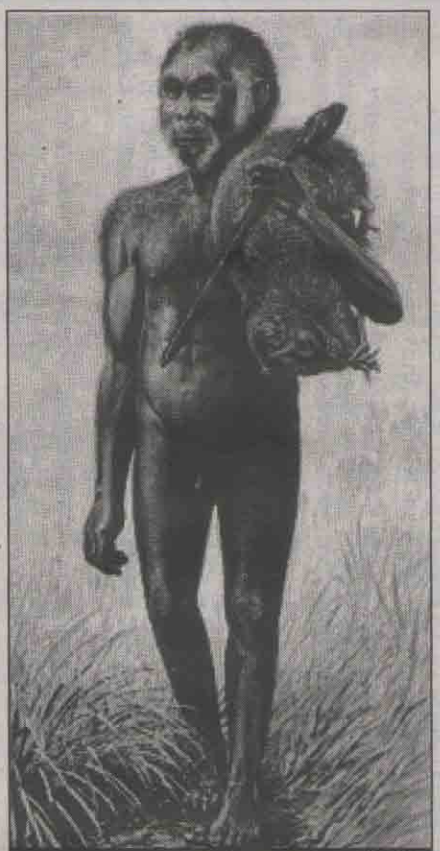

আবদ্ধ হয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে হলো দীর্ঘ দুই হাজার বছর! আঠারশ' শতাব্দীর কার্ল লিনিয়াস (১৭০৭-১৭৭৮) কে জীবের শ্রেণীবিন্যাসের জনক বলে ধরা হয়, তিনিই প্রথমবারের মতো জীবের শ্রেণীবিন্যাসের একটি সাধারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তৈরি করেন। লিনিয়াসও তখনকার দিনের রেওয়াজ অনুযায়ী একজন প্রকৃতিবিদ হিসেবে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর শ্রেণীবিন্যাস করে স্রষ্টার তুষ্টি লাভেই বেশি আগ্রহী ছিলেন (১)। এমনকি প্রথম জীবনে তিনি মনে করতেন যে প্রজাতিরা সৃষ্টি লগ্ন থেকে অপরিবর্তনীয় অবস্থায়ই রয়ে গেছে, যদিও পরবর্তীতে এই মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি বলেন, এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির হয়তো সৃষ্টি হয় এবং ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রকৃতিতে অনবরত সংগ্রামও চলে, তবে এর সব কিছুই ঘটে স্বর্গীয় নির্দেশে। বিজ্ঞানীরা গত ২০০ বছর ধরে লিনিয়াসের এই শ্রেণীবিন্যাসের পদ্ধতিকে (অল্প কিছু পরিবর্তনসহ) স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন। শুধু পার্থক্য এই যে, লিনিয়াস এই মডেল আবিষ্কার করেছিলেন মহান স্রষ্টার সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করার জন্য আর আজকের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জীবকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেন তাদের মধ্যকার সঠিক বিবর্তনীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে।

জীবের বিবর্তনবাদ তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রা শুরু হয় আসলে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ব্রিটিশ প্রকৃতিবিদ চার্লস ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) হাত ধরে। তিনি বললেন,

কোন প্রজাতিই চিরন্তন বা স্থির নয়, বরং এক প্রজাতি থেকে পরিবর্তিত হতে হতে আরেক প্রজাতির জন্ম হয়, পৃথিবীর সব প্রাণই কোটি কোটি বছর ধরে তাদের পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হতে হতে এখানে এসে পৌঁছেছে।

মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসের বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে কয়েকশ' কোটি বছর পেছনে গেলে অন্যসব জীবের মতোই দেখা যাবে যে তাদেরও আদি উৎপত্তি হয়েছিল সেই একই আদিম এক কোষী প্রাণী থেকে। ডারউইনের দেয়া বিবর্তনবাদ তত্ত্বটি আজকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত; এটি বিবর্তনবাদের একমাত্র তত্ত্ব যা সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আজকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ তিনি অন্যদের মতো শুধু একটি ধারণা প্রস্তাব করেই ক্ষান্ত হননি, বিবর্তনের এই প্রক্রিয়াটি কীভাবে কাজ করে তার পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন সবিস্তারে, প্রথমবারের মতো। কিন্তু উনবিংশ শতকের সেই সময়ে রক্ষণশীল খ্রিস্ট ধর্মের প্রবল প্রতাপে প্রকৃতি বিজ্ঞান যখন মুখ থুবড়ে পড়েছিল তখন ডারউইন এরকম একটি বৈপ্লবিক মতবাদ দিতে পারলেন কীভাবে? আসলে ডারউইনের আগের হাতেগোনা কয়েকজন সাহসী পূর্বসূরি ইতোমধ্যেই কাজ কিছুটা এগিয়ে নিয়েছিলেন; পৃথিবী তখন অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল এমন একজনের জন্য, যিনি তখন পর্যন্ত পাওয়া, বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন তথ্য এবং সিদ্ধান্তগুলোকে এক বিনি সুতোর মালায় গেঁথে জীববিজ্ঞানকে এগিয়ে দেবেন তার পরবর্তী স্তরে। তিনিই হলেন চার্লস রবার্ট ডারউইন।

তাই, ডারউইনের গল্পে আসার আগে তার এই পূর্বসূরিদের কয়েকজনের অবদান সম্পর্কে দু' একটি কথা না বলে নিলে বিবর্তনের ইতিহাসের গল্পটি হয়তো অসমাপ্তই রয়ে যাবে। প্রথমেই বলতে হয় ফরাসি জীববিজ্ঞানী ল্যামার্কের (জীন-ব্যাপটিস্ট ল্যামার্ক, ১৭৪৪-১৮২৯) কথা। মজার

৮ম বর্ষ ২৪ সংখ্যা, ২৯ এপ্রিল ২০০৬

ব্যাপার হচ্ছে, জীববিজ্ঞানে ল্যামার্ক তার অবদানের জন্য যতখানি পরিচিত, তার চেয়ে ঢের বেশি পরিচিত বিবর্তনতত্ত্ব নিয়ে তার ভুল মতবাদের কারণে। ল্যামার্ক সঠিকভাবেই সিদ্ধান্তে আসেন যে, প্রজাতি সুস্থির নয়, এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির বিবর্তন ঘটে, তবে তিনি যে পদ্ধতিতে এই পরিবর্তন ঘটে বলে প্রকল্প দেন তা পরবর্তী সময়ে সম্পূর্ণভাবে ভুল বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু এটা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, ল্যামার্কই হচ্ছেন প্রথম বিজ্ঞানী যিনি প্রজাতির স্থিরতাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে চ্যালেঞ্জ করে বিবর্তনের চালিকাশক্তি এবং পদ্ধতি সম্পর্কে একটি যুক্তিযুক্ত উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলেন।

তার মতবাদ সাড়া পৃথিবী জুড়ে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং এখনও প্রায়ই দেখা যায় যারা বিবর্তন সম্পর্কে ভাসা ভাসা ধারণা রাখেন তাদের অনেকেই ল্যামার্কিয়ান মতবাদকে ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বের সাথে গুলিয়ে ফেলেন। ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার পরে ল্যামার্কিয়ান তত্ত্বের সাথে এর পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল পরবর্তী কোনও অধ্যায়ে। ডারউইনের দাদা ড. ইরেমাস ডারউইনও (১৭৩১-১৮০২) ছিলেন একজন প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ এবং জীবের বিবর্তনের মতবাদের সক্রিয় সমর্থক। তিনি কোনও ধর্মীয় বিধি বিধানে বিশ্বাস করতেন না, তবে মনে করতেন যে, এক পরমেশ্বরের নির্দেশেই জীব জগৎ, তার চারদিকের প্রতিকূল প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য অনবরত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, আর এই পরিবর্তন চলছে বাইবেলের বলা কয়েক হাজার বছর নয়, বরং বহু কোটি বছর ধরে।

এবার আসা যাক, প্রখ্যাত ভূ-তত্ত্ববিদ চার্লস লায়েলের (চার্লস লায়েল ১৭৯৫-১৮৭৫) কথায়, ডারউইনের বিবর্তনবাদ মতবাদের আবিষ্কারের পেছনে তার অবদান অনস্বীকার্য। ডারউইন লায়েলের লেখা "Principle of Geology" বইতে ভূ-তত্ত্বের সদাপরিবর্তনশীলতার ধারণা দিয়ে খুবই প্রভাবিত হন। লায়েল বললেন,

নুহের আমলের এক মহাপ্লাবন দিয়ে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন হয়নি, বরং হয়েছে ধীরে ধীরে বহু কোটি বছর ধরে প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর কারণে– বৃষ্টি, আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নুৎপাত, ভূমিকম্প, বাতাসের মতো অসংখ্য প্রাকৃতিক শক্তি যুগে যুগে ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন ঘটিয়ে এসেছে এবং এখনও একইভাবে এই পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

যদিও লায়েলই প্রথম এই মতবাদটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন, তার মতবাদের বেশিরভাগ অংশই এসেছিল তার পূর্বসূরি ভূ-তত্ত্ববিদ, ইতিহাসের পাতায় প্রায় হারিয়ে যাওয়া, জেমস হাটনের দেয়া মতবাদ থেকে। সে গল্প আপাতত তোলা থাকল পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য। লায়েলের এই মতবাদ তখনকার সমাজে তীব্রভাবে সমালোচনার সম্মুখীন হলেও পরবর্তী সময়ে তা ডারউইনকে খুবই প্রভাবিত করে। অনেকেই মনে করেন যে লায়েলের এই মতবাদ হাতের সামনে না থাকলে ডারউইন এত সহজে বিবর্তনবাদের পক্ষে তার যুক্তি খাঁড়া করতে পারতেন না। ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বের পেছনে লায়েলের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অবদান এতখানিই যে, তাকে ছাড়া এই গল্প বলা একরকম অসম্ভবই বলতে হবে, তাই পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে দেখা যাবে তার প্রসঙ্গ বারবারই সামনে এসে পড়ছে।

অনেকটা হঠাৎ করেই ১৮৩১ সালে ডারউইন বিগেল জাহাজে করে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে শুরু করে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ৫ বছরের জন্য ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পেয়ে যান। তখন তিনি মোটে কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজ থেকে বিএ পাস করে বেরিয়েছেন। ছেলেকে ডাক্তার এবং আইনজ্ঞ বানানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ডারউইনের বাবা ডঃ রবার্ট ডারউইন শেষ পর্যন্ত তাকে ধর্মজাযক বানানোর জন্য এই ক্রাইস্ট কলেজে পাঠান। কিন্তু তাতে আপাতভাবে হিতে বিপরীতই হলো! ধর্মজাযক হওয়া তো দূরের কথা, তিনিই শেষ পর্যন্ত চরম আঘাত হানলেন সনাতন ধর্মের উপর তার বিবর্তনবাদ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বীগেল জাহাজে ওঠার সময়ও কিন্তু তিনি অন্যান্য ছাত্রদের মতোই সৃষ্টিতত্ত্ব এবং জীবের স্থিতিশীলতার তত্ত্বে বিশ্বাসী একজন প্রকৃতিবিদ ছিলেন, লায়েলের তত্ত্ব তখনও তার পড়া হয়ে ওঠেনি। তাহলে, এই ৫ বছরের বিশ্ব অভিযানে বেরিয়ে ডারউইন এমন কি দেখলেন যে তার এই ধারণাগুলোর আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল? আসলে, হঠাৎ করে পুরো পৃথিবী ঘুরে দেখার সুযোগ ও দক্ষিণ আমেরিকার বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির সাথে তার স্বভাবজাত ধৈর্য, গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি, অনুসন্ধিৎসু মন এবং সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতিকে সমন্বয় করে জীবের উৎপত্তি এবং বিকাশ সম্পর্কে তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন তা আমাদের হাজার বছর ধরে লালন করা সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত প্রাচীন এবং ধর্মীয় চিন্তা পদ্ধতিগুলোকে ভেঙে গুড়িয়ে দিল। ডারউইনের নিজের কাছেই বিবর্তনবাদ তত্ত্বটি এতখানি বিপ্লবাত্মক মনে হয়েছিল যে তিনি তা প্রচার করতেও যথেষ্ট দ্বিধাবোধ করছিলেন। বীগেল জাহাজের ৫ বছরব্যাপী বিশ্বভ্রমণ শেষ করে এসে, ১৮৩৭ সালের দিকেই প্রজাতির উৎপত্তি নিয়ে লিখতে শুরু করলেও ১৮৫৯ সালের আগে তিনি 'On the origin of species by means of Natural Selection...' বা ছোট করে বললে 'প্রজাতির উৎপত্তি' বইটি প্রকাশ করেননি। হুকারের কাছে লেখা এক চিঠিতে ডারউইন এ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছিলেন যে, এই তত্ত্বটি প্রস্তাব করতে গিয়ে তার নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে, বিবর্তনের এই গল্প বলতে গিয়ে মনে হচ্ছে তিনি যেন একজন নরঘাতক হিসেবে স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, ডারউইনের শিক্ষক এবং প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী প্রফেসর হেনস্লো ১৮৩১ সালে লায়েলের লেখা বইটি উপহার দেন জাহাজে বসে পড়ার জন্য। গভীরভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাসী শিক্ষকমশাই পইপই করে এও বলে দেন ডারউইন যেন লায়েলের সব সিদ্ধান্তই আবার বোকার মতো বিশ্বাস না করে বসেন! কিন্তু আবারও হিসাবে গণ্ডগোল হয়ে গেল, তিনি যতই বিশ্ব-প্রকৃতি ঘুরে দেখতে থাকলেন ততই এর পক্ষে আরও বেশি করে সাক্ষ্য প্রমাণ পেলেন (৪) এবং লায়েলের সদাপরিবর্তনশীলতার ধারণাতে দীক্ষিত হয়ে উঠলেন। ডারউইন এ সময়ে মূলত ভূ-তত্ত্ব নিয়েই গবেষণা করছিলেন এবং ভ্রমণ শেষে তিনি ভূ-প্রকৃতি নিয়ে উল্লেখযোগ্য তিনটি বইও লেখেন। কিন্তু এর মধ্য দিয়েই জীবজগত নিয়ে তার বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটতে থাকে, বিচিত্র ভূ-প্রকৃতির সাথে বিচিত্র সব জীবের সমারোহ দেখতে দেখতে তিনি আরও গভীরভাবে জীবের উৎপত্তি এবং বিকাশ নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের চিলির উপকূলে নোঙ্গর করা বীগেল জাহাজের ভেতরে হঠাৎ একদিন ভীষণভাবে আঁতকে উঠলেন ডারউইনসহ জাহাজের অন্যান্য বাসিন্দারা। দুই মিনিট ধরে যেন এক মহাপ্রলয় ঘটে গেল পৃথিবীজুড়ে। ভূমিকম্প শেষ হলে ডারউইন এবং বীগেলের ক্যাপটেন ফিটজরয় সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন যে, উপকূলের ভূমির উচ্চতা বেড়ে গেছে প্রায় ৮ ফুট! তাহলে কি লায়েলের হিসাবই ঠিক? সেই অনাদিকাল থেকে প্রাকৃতিক শক্তিগুলোই পরিবর্তন করে আসছে আমাদের এই পৃথিবীর চেহারা? আবার একদিন কেপ ভার্ডে নামে এক দ্বীপপুঞ্জে নেমে তিনি দেখলেন একটি সাদা দাগ চলে গেছে মাইলের পর মাইলজুড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে (৩)। কৌতূহলী ডারউইন পরীক্ষা করে বুঝলেন যে, এগুলো আর কিছুই নয়, বহু বছর ধরে শামুক-ঝিনুকের খোলসের চুনাপাথর থেকে এই সাদা দাগের সৃষ্টি হয়েছে, ঠিক একইরকম দাগ বয়ে চলে গেছে সমুদ্রের পার বেয়েও। ডারউইন আবারও লায়েলের তত্ত্বের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হলেন, তার মানে সমুদ্রের পার থেকে ৪৫ ফুট উপরের এই এলাকাটি এক সময় সমুদ্রের নিচে ছিল এবং অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সমুদ্রের নিচ থেকে এত উপরে উঠে এসেছে! প্রকৃতিতে এ রকম বড় বড় পরিবর্তনের উদাহরণের তো কোনও অভাব নেই, যেমন–মানচিত্র খুললে আজ যে ৭টি মহাদেশ আমরা একেক জায়গায় দেখি, তিনশ' কোটি বছর আগে কিন্তু এভাবে ছিল না। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেন যে, কন্টিনেন্টাল ড্রিফট বা মহাদেশীয় সঞ্চারণের মাধ্যমে এক সময় তারা আলাদা হয়ে বিভিন্ন মহাদেশের সৃষ্টি করে এবং এই সঞ্চারণ আজও ঘটে চলেছে বিরামহীনভাবে। সে যাই হোক, এখন আবার ফিরে যাওয়া যাক আমাদের আসল গল্পে। ডারউইন লায়েলের এই তত্ত্বকেই

পরবর্তী সময়ে কাজে লাগান জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, যদিও লায়েল নিজে প্রজাতির পরিবর্তনের ধারণাকে ভুল বলে মনে করতেন। চারপাশের বিচিত্র প্রাণী আর উদ্ভিদের সমারোহ দেখতে দেখতে ডারউইনের সন্দেহ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে যে জীবজগতও স্থির হতে পারে না, এদের অতীতে পরিবর্তন ঘটেছে এবং আজও তা ঘটে চলেছে। বীগেল জাহাজে ভ্রমণকালীন সময়ে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কয়েকটি বড় বড় অভিযান চালান। এরকম একটি থেকে ফিরে এসে তিনি তার বোন সুজানকে লেখা একটি চিঠিতে বলেন যে, এটি ছিল তার সবচেয়ে সফল অভিযান কারণ এর পরই তিনি নিশ্চিত হন যে,

"আসলে এত দিন ধরে চলে আসা ভূ-প্রকৃতির স্থিতিশীলতার তত্ত্বটি ভুল, লায়েলের সদা-পরিবর্তনশীল ভূ-প্রকৃতির ধারণাই আসলে সঠিক। এই উপলব্ধিটিই পরবর্তী সময়ে প্রাণের বিবর্তন সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে" (৯)।

তখনও অন্যান্য ফসিলবিদদের আবিষ্কৃত বেশ কিছু ফসিলের উদাহরণ ছিল ডারউইনের সামনে, কিন্তু সেগুলোর ওপর তার মূল সিদ্ধান্ত ভিত্তি না করে তিনি বেশিরভাগ উদাহরণই সংগ্রহ করেন প্রকৃতিতে বিদ্যমান বিচিত্র প্রাণী এবং উদ্ভিদ থেকে। তিনি প্রকৃতিতে এত বৈচিত্র্যময় প্রাণের সমাহার এবং তাদের মধ্যকার বিপুল সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য দেখে বিস্মিত হন। একই ধরনের কাছাকাছি শারীরিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রজাতিগুলোকে কেন সাধারণত একই মহাদেশে বা কাছাকাছি দ্বীপপুঞ্জেই দেখা যায়? আবার অন্যদিকে ওই প্রতিটি প্রজাতির খাদ্যাভ্যাস বা বসবাসের পরিবেশের মধ্যে কেন এত লক্ষণীয় রকমের পার্থক্য দেখা যায়? কেন আফ্রিকা মহাদেশেই শুধু বিভিন্ন প্রজাতির জেব্রা দেখা যায়, মারসুপিয়াল (পেটের কাছের থলিতে বাচ্চা বড় করতে পারে এমন ধরনের প্রাণীদের মারসুপিয়াল বা Marsupian জাতীয় প্রাণী বলা হয়) জাতীয় ক্যাঙ্গারু বা কোয়ালা কেন পাওয়া যায় শুধু অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে? আবার দক্ষিণ আমেরিকার দ্বীপে উড়তে অক্ষম দু'ধরনের বেশ বড় আকৃতির পাখি দেখা গেলেও অস্ট্রেলিয়ার ইমু বা আফ্রিকার উটপাখীর সাথে তাদের কোনও মিল নেই। স্থলচর প্রাণীর মধ্যে ইউরোপের মতো এখানে খরগোশ নেই, আছে কয়েক ধরনের তীক্ষ্ণ দাঁতসম্পন্ন অন্য ধরনের ইঁদুর, জলচর প্রাণীর মধ্যে কয়পাস বা ক্যাপিব্যারাসের মতো প্রাণী থাকলেও বিবরজাতীয় প্রাণীর তো দেখা পাওয়া যাচ্ছে না এখানে! গ্যালাপ্যাগাস দ্বীপপুঞ্জে এবং তার কাছাকাছি এলাকাগুলোতে ১৪ ধরনের প্রজাতির ফিঞ্চ পাখি, ১৬ প্রজাতির শামুক, তিন রকমের প্রকাণ্ড আকারের কচ্ছপ এবং গিরিগিটির মতো দেখতে কয়েক প্রজাতির ইগুয়ানা দেখা যায় যেগুলো পৃথিবীর আর কোনও অঞ্চলে দেখা যায় না। দক্ষিণ আমেরিকায় আরও আছে টেপির, চিনচিলা, আর্মাডিলা, লামা, জাগুয়ার, প্যান্থার, বিশাল আকৃতির এন্ট ইটার এবং আরও অনেক প্রাণী যাদেরকে আফ্রিকা মহাদেশে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আবার আফ্রিকার সিংহ, হাতি, গণ্ডার, জলহস্তী, জিরাফ, হায়েনা, লেমুর, শিম্পাঞ্জির মতো প্রাণীগুলো সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত সেই মহাদেশে। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি তার বইতে লেখেন, জৈব-ভৌগোলিক উদাহরণগুলো নিয়ে যারা কাজ করছেন, তারা নিশ্চয়ই 'কাছাকাছি প্রজাতিগুলোর' মধ্যে একই ধরনের বৈশিষ্ট্যের বা প্যাটার্নের রহস্যময় সমন্বয় দেখে অবাক না হয়ে পারে না (৭)।

ডারউইন এই গ্যালাপ্যাগাসের দ্বীপগুলোতেই সবচেয়ে বিচিত্র ধরনের প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন, যা তাকে পরবর্তী সময়ে বিবর্তনের পক্ষের প্রমাণগুলো প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে। গ্যালাপ্যাগাসের বিভিন্ন দ্বীপগুলোতে যে ১৪ ধরনের ফিঞ্চ দেখতে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে ডারউইন নিজেই ১৩টি সংগ্রহ করেছিলেন। এই ফিঞ্চ পাখিগুলো হচ্ছে বিবর্তনীয় অভিযোজন (অ্যাডাপশন) বা বিবর্তনের ফলে এক প্রজাতি থেকে বিচিত্র বহু ধরনের প্রজাতি সৃষ্টি হওয়ার একটি চমৎকার উদাহরণ। বিস্মিত ডারউইন লক্ষ করলেন যে, তাদের সার্বিক দৈহিক গঠনে প্রচুর মিল থাকলেও ঠোঁটের আকৃতি ও গঠনে বেশ উল্লেখযোগ্য রকমের পার্থক্য রয়েছে।

(চলবে)

Reference

(1) http://www.ucmp.berkely.edu/history/linnaeus.html

(2) Ridley, Mark (2004), Evolution, BlackwellPublishing, Oxford, United Kingdom.

(৩) ড. ম আখতারুজ্জামান, (২০০২), বিবর্তনবাদ। হাসান বুক হাউস, ঢাকা, বাংলাদেশ।

(4) http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/02/4/l_024_01.html

(6) Dr. Berra, M. Tim (1990), Evolution and the Myth of Creationism. Stanford University Press, Stanford, California

(7) National Geographic Magazine, Was Darwin Wrong, November 2004 edition.

(৯) সুশান্ত মজুমদার, ২০০৩, চার্লস ডারউইন এবং বিবর্তনবাদ, প্রকাশক : সোমনাথ বল, কোলকাতা, ইন্ডিয়া।

(10) http://www.guardian.co.uk/life/feature/story/0,13026, 155974300.html

লেখক পরিচিতি : বন্যা আহমেদ বর্তমানে আমেরিকায় পাবলিক হেলথ সেক্টরে সিস্টেম অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ করছেন। এর আগে কাজ করেছেন টেলি কমিউনিকেশনস ইন্ডাস্ট্রিতে ফাইবার অপটিক্স নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রায় ৭ বছর। লেখাপড়া করেছেন বায়োটেকনোলজি এবং কম্পিউটার সায়েন্সে।

দ্বি তী য় অ ধ্যা য়

বিবর্তনে প্রাণের স্পন্দন

গত সংখ্যার পর

ডারউইন এই গ্যালাপ্যাগাসের দ্বীপগুলোতেই সবচেয়ে বিচিত্র ধরনের প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন, যা তাকে পরবর্তী সময়ে বিবর্তনের পক্ষের প্রমাণগুলো প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে। গ্যালাপ্যাগাসের বিভিন্ন দ্বীপগুলোতে যে ১৪ ধরনের ফিঞ্চ দেখতে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে ডারউইন নিজেই ১৩টি সংগ্রহ করেছিলেন। এই ফিঞ্চ পাখিগুলো হচ্ছে বিবর্তনীয় অভিযোজন (অ্যাডাপশন) বা বিবর্তনের ফলে এক প্রজাতি থেকে বিচিত্র বহু ধরনের প্রজাতি সৃষ্টি হওয়ার একটি চমৎকার উদাহরণ। বিস্মিত ডারউইন লক্ষ করলেন যে, তাদের সার্বিক দৈহিক গঠনে প্রচুর মিল থাকলেও ঠোঁটের আকৃতি ও গঠনে বেশ উল্লেখযোগ্য রকমের পার্থক্য রয়েছে।

এদের মধ্যে আবার ৬টি মাটিতে বাস করে এবং

ডারউইনের ২২ বছর বয়সের ছবি। এ সময়ই তিনি বিগেল জাহাজের যাত্রা শুরু করেন

বাকিরা থাকে গাছে। যারা মাটিতে থাকে তাদের মধ্যে একটি অংশ বিভিন্ন ধরনের বীজ খেয়ে বেঁচে থাকে আর বাকিদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে ক্যাকটাস জাতীয় গাছের ফুল। দেখা গেল যারা বীজ খায় তাদের ঠোঁট বেশ মোটা যা তাদেরকে বীজ ভাঙতে সহায়তা করে, আবার যারা ক্যাকটাসের ফুল খায় তাদের ঠোঁটগুলো হচ্ছে সোজা এবং খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ফুল খাওয়ার উপযোগী। যারা গাছে থাকে এবং পোকা-মাকড় ধরে খায় তাদের ঠোঁটের আকৃতি আবার ঠিক সেরকমই লম্বা যাতে তারা গর্ত থেকে পোকা ধরে নিয়ে আসতে পারে। ডারউইন এই পর্যবেক্ষণ থেকে লিখেছেন, 'সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হচ্ছে এই প্রজাতিগুলোর ঠোঁটের নিখুঁত ধাপে ধাপে ঘটা

এলাম আমরা কোথা থেকে?

বন্যা আহমেদ

ডারউইন বীগেল জাহাজে ওঠার সময় জীবের স্থিতিশীলতার তত্ত্বে বিশ্বাসী একজন প্রকৃতিবিদ ছিলেন। ৫ বছর ধরে তিনি যতই বিভিন্ন দ্বীপে ঘুরলেন, খুব কাছ থেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে চারদিকের প্রকৃতি আর তার সৃষ্টিকে দেখলেন ততই তার সন্দেহ বাড়তে লাগল। আর তারই ফলশ্রুতিই আমরা পরবর্তী সময়ে পেলাম জীবের বিবর্তনের মতবাদ

ক্রমবিকাশ...একটি ছোট ও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত পাখির দলের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের এই ক্রমাগত রূপান্তর ও বৈচিত্র্য দেখে যে কেউ অবশ্য কল্পনা করতে পারে যে এই দ্বীপগুলোতে পাখির প্রাথমিক অভাব দূর করার জন্য একটি মূল প্রজাতি থেকে নিয়ে বিভিন্ন পরিবেশের জন্য উপযোগী ও পরিবর্তন করে অন্যদের তৈরি করা হয়েছে (৬)। তিনি পরবর্তী সময়ে তার বইতে লেখেন,

বিভিন্ন জীবের মধ্যে এলাকা এবং সময় বিশেষে এই নিবিড় সম্পর্কের কারণ উত্তরাধিকার ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না, অর্থাৎ এই কাছাকাছি ধরনের প্রজাতিরা সাধারণত খুব কাছাকাছি এলাকায় বাস করে কারণ তারা এক সময় একই পূর্বপুরুষ থেকে পরিবর্তিত হতে হতে বিভিন্ন প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে (৭)।

এতদিনের সৃষ্টিতত্ত্ব আমাদেরকে যা শিখিয়ে এসেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ধরে নিতে হবে যে, কোনও এক সৃষ্টিকর্তা বিভিন্ন পরিবেশের সাথে উপযোগী করে বিভিন্ন জায়গার প্রাণী এবং উদ্ভিদ তৈরি করেছিলেন। কিন্তু এই যুক্তির সাথেই কি বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণ উদাহরণের কোনও মিল পাওয়া যাচ্ছে? তাহলে তো একই ধরনের জলবায়ু এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জায়গাগুলোতে একই রকমের প্রাণী দেখা যাওয়ার কথা ছিল! ডারউইন দেখলেন যে, বিভিন্ন মহাদেশের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে মিল বা অমিল-কোনওটাকেই শুধু পরিবেশগত পার্থক্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। যেমন, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের প্রাণীগুলোর সাথে অন্য মহাদেশের প্রাণীর তেমন কোনও মিল নেই, আবার আমরা দেখেছি যে, দক্ষিণ আমেরিকার প্রাণীগুলোও দেখতে বেশ অন্যরকম। অথচ ইউরোপ, এশিয়া বা আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায় তো অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আমেরিকার মতো পরিবেশ দিব্যি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে! আবার গ্যালাপ্যাগাস বা দক্ষিণ আমেরিকার কাছাকাছি দ্বীপগুলোর প্রাণীদের সাথে তার মূল ভূখণ্ডের প্রাণীদের যেরকম মিল পাওয়া যাচ্ছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জীবজন্তুর সাথে তা পাওয়া যাচ্ছে না। ডারউইন যদি এই

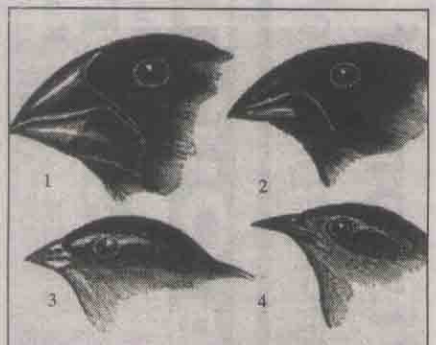

ডারউইনের আঁকা কয়েক প্রজাতির ফিঞ্চের ছবি

দ্বীপগুলোতে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের প্রাণী দেখতেন তাহলে সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে তার মনে হয়তো প্রশ্ন উঠতো না, কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখণ্ডের সাথে তাদের এই পরিমাণ সাদৃশ্য তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। তিনি প্রশ্ন করলেন, সৃষ্টির সময় এসব দ্বীপে যদি বিভিন্ন জীবদের রেখে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে এদের গায়ে দক্ষিণ আমেরিকার ছাপ কেন? আবার ঠিক বিপরীতভাবে দেখা যাচ্ছে, কাছাকাছি জায়গার দ্বীপগুলোতে বাস করা বিভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তুর মধ্যে রয়েছে অকল্পনীয় রকমের বৈচিত্র্য! বিস্মিত হয়ে ডারউইন লিখলেন যে তিনি এত কাছাকাছি, মাত্র ৫০-৬০ মাইল দূরে অবস্থিত দ্বীপগুলো, যাদের একটি থেকে অন্যটিকে খালি চোখে দেখা যায়, যারা একই

শীলায় তৈরি, একই জলবায়ুর অধীন, এমনকি যাদের উচ্চতাও এক–তাদের মধ্যে এত ভিন্ন ধরনের বাসিন্দা দেখা যাবে তা স্বপ্নেও আশা করেননি (৩)।

দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া নানা ধরনের প্রাণীর ফসিলও চোখে পড়েছিল ডারউইনের। বহুদিন আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এসব প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যের সাথে আজকের পৃথিবীর প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য তুলনা করে তিনি প্রজাতির স্থায়িত্ব নিয়ে আরও সন্দিহান হয়ে পড়লেন। পৃথিবীর বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক স্তরে কেন বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর ফসিল পাওয়া যাচ্ছে? ভূতাত্ত্বিকভাবে যেমন অপেক্ষাকৃত পুরনো স্তরের উপরে থাকে তার চেয়ে কম পুরনো স্তরটি, ঠিক একইভাবে যে জীব যত প্রাচীন তার ফসিলও পাওয়া যায় ততই প্রাচীন স্তরের মধ্যেই। ডারউইন লক্ষ করলেন, কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদগুলোর ফসিলগুলোকে সময়ের ধারাবাহিকতায় তৈরি একটির উপরে আরেকটি ভূতাত্ত্বিক স্তরের মধ্যেই শুধু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে কি একটি প্রজাতির থেকে কাছাকাছি আরেকটি প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে নাকি এ ধরনের মিলগুলোকে কেবলই কাকতালীয় ঘটনা বলে ধরে নিতে হবে? কিন্তু ফসিল রেকর্ডে তো স্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে যে একটি প্রাণী হাজার বছর ধরে টিকে থেকে এক সময় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, কোনও স্তরেই তার আর কোনও ফসিল পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু ঠিক তার উপরের স্তরেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ আরেকটি নতুন ধরনের প্রজাতি।

শুধু দেড়শ' বছর আগে ডারউইনের সময়ই নয়, একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এসেও এখন পর্যন্ত এমন একটি ফসিল পাওয়া যায়নি যা কিনা এই নিয়মের বাইরে পড়েছে। কয়েকদিন আগে, ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরের ১ তারিখে বিবর্তনের বিপক্ষ শক্তির প্রচারণাকে খণ্ডন করতে গিয়ে আজকের দিনের বিখ্যাত বিবর্তনবাদী প্রফেসর রিচার্ড ডকিনস বলছেন, "...And far telling-not a single authentic fossil has ever been found in the "wrong" place in the evolutionary sequence. Such an anachronistic fossil, if one were ever unearthed, would blow evolution out of the water..." (10).

একটি বহুল আলোচিত উদাহরণ দেয়া যাক এ প্রসঙ্গে। উত্তর আমেরিকায় একেবারে নীচের দিকের প্রাচীন স্তরে (প্রায় ৫ কোটি বছর আগের) পাওয়া গেছে খানিকটা ঘোড়ার মতো দেখতে Hyracotherium নামক একটি প্রাণী, তারপর বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন সময়ে পাওয়া গেছে Orohippus, Epihippus, Mesohippus, Hipparion, Pliohippus এবং আরও অনেক ধরনের মাঝামাঝি ধরনের ঘোড়ার ফসিল। কিন্তু প্রায় ৫০ লক্ষ বছর আগে এদের একটি প্রজাতি ছাড়া বাকি সবাই বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং এর থেকেই পরবর্তি সময়ে সৃষ্টি হয় আজকের যুগের আধুনিক ঘোড়ার বিভিন্ন প্রজাতি। ডারউইনের সময় এত ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন স্তরের ফসিল পাওয়া না গেলেও তিনি এর পেছনের সম্ভাব্য কারণটা ঠিকই খুঁজে বের করতে পেরেছিলেন।

তিনি এ ধরনের উদাহরণগুলো থেকে ক্রমশঃ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে থাকেন যে, ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত প্রজাতিরা বিবর্তনের মাধ্যমে একে-অন্যকে প্রতিস্থাপিত করেছে। তিনি বলেন, 'সমস্ত ফসিলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, হয় তারা বর্তমান কোনও গোষ্ঠীর মধ্যে পড়বে, নয় তো তাদের জায়গা হবে দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যের কোনও জায়গায়'।

এই মুহূর্তে ফসিল রেকর্ড নিয়ে আর বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না, বিবর্তনবাদ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ফসিল রেকর্ডের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তাই পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিতভাবে লেখার আশা রাখি।

ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার সাথে বিভিন্ন প্রজাতির মিল বা অমিলের কি কোনও সম্পর্ক রয়েছে? পরবর্তীকালে ডারউইন বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ এবং তার সংগৃহীত অসংখ্য জীবিত এবং ফসিলের নমুনা থেকে উপলব্ধি করেন যে, ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার সাথে বিভিন্ন প্রজাতির সাদৃশ্য বা অসাদৃশ্যের একটি সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বললেন,

দু'টি এলাকা যদি দীর্ঘকাল ধরে বিচ্ছিন্ন থাকে, তাদের মাঝে মহাসমুদ্র, খুব উঁচু পর্বতশ্রেণী বা এ ধরনের অন্য কোনও প্রতিকূল বাধা থাকে যা অতিক্রম করে প্রাণীরা অন্যদিকে পৌঁছতে পারবে না, তাহলে তাদের স্থানীয় জীবজন্তু, গাছপালাগুলো স্বতন্ত্রভাবে বিবর্তিত হতে শুরু করবে এবং এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ক্রমাগতভাবে চলতে চলতে দীর্ঘকাল পর দেখা যাবে যে, এই দুই অঞ্চলের প্রাণীদের অনেকেই অন্যরকম প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। আবার যে অঞ্চলগুলোর মধ্যে এ ধরনের কোনও বাধার দেওয়াল নেই, সেখানে বিস্তীর্ণ অঞ্চল বা সমস্ত এলাকা জুড়েই একই ধরনের জীব দেখা যাবে (৯)।

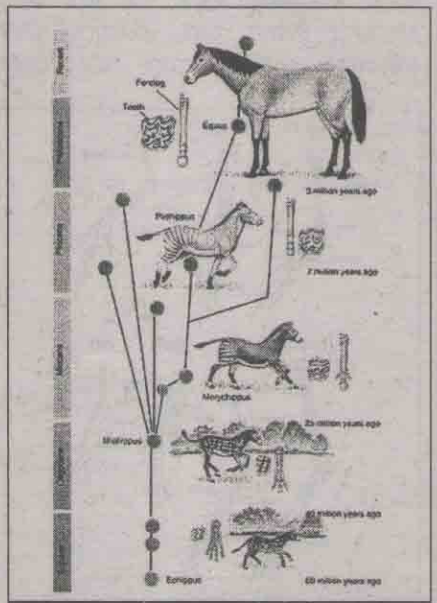

ঘোড়ার বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর

এ প্রসঙ্গে দু'টি মজার উদাহরণ দেয়ার লোভ সামলাতে পারছি না। আমরা সাধারণত মারসুপিয়াল (ক্যাঙ্গারু, কোয়ালা, ইত্যাদি প্রাণী) জাতীয় প্রাণীর বাসস্থান বলতে অস্ট্রেলীয় মহাদেশকেই বুঝি। কিন্তু শুধু অস্ট্রেলিয়া নয়, দক্ষিণ আমেরিকায় আজও গুটিকয়েক মারসুপিয়াল জাতীয় প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। এর কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়, একসময় দক্ষিণ আমেরিকা অ্যান্টারক্টিকার মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ার সাথে সংযুক্ত ছিল, তখন সেখান থেকে মারসুপিয়াল জাতীয় প্রাণীগুলো অ্যান্টারক্টিকা হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছায়। তারপর দক্ষিণ আমেরিকায় কয়েকটি ছাড়া প্রায় সবগুলো মারসুপিয়াল প্রাণী বিলুপ্তির পথ ধরলেও অস্ট্রেলিয়ায় তারা আধিপত্য বিস্তার করে নেয়। আর ইতোমধ্যে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা এবং অ্যান্টারক্টিকা একে অপরের থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আর তার ফলে অস্ট্রেলিয়ায় তাদের বিবর্তন ঘটতে থাকে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্রভাবে, নিজস্ব গতিতে, যার ফলশ্রুতিতেই আমরা আজকে অস্ট্রেলিয়ায় এত বিচিত্র প্রাণীর সমাবেশ দেখতে পাই, যার নমুনা অন্যান্য অঞ্চলে দেখা যায় না বললেই চলে। আর অন্যদিকে, বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে অ্যান্টারক্টিকা মহাদেশের পরিবেশ ক্রমাগতভাবে খুব বেশি ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ায় সেখানকার সব স্তন্যপায়ী প্রাণী-বিলুপ্ত হয়ে যায়। আবার ঠিক এর বিপরীত ঘটনা ঘটতে দেখা যায় ঘোড়ার ইতিহাসের ক্ষেত্রে। আমরা ফসিল রেকর্ড থেকে আগেই দেখেছি যে, উত্তর আমেরিকায় প্রথম ঘোড়ার পূর্বপুরুষের উদ্ভব ঘটে। যখন উত্তর আমেরিকা, প্রায় ২০-৩০ লাখ বছর আগে, তার উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে রাশিয়ার মাধ্যমে এশিয়া মহাদেশের সাথে সংযুক্ত ছিল তখন আধুনিক ঘোড়ার একটা অংশ এশিয়া হয়ে ইউরোপ এবং আফ্রিকা পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং পরবর্তী সময়ে এই মহাদেশগুলোর সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এক সময় উত্তর আমেরিকার সাথে এশিয়ার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন কারণে ১০-১৫ হাজার বছর আগে উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ঘোড়াও সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু পনেরশ' শতাব্দীতে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর আবার নতুন করে ইউরোপ থেকে আমেরিকায় ঘোড়ার আমদানি করা হয়। ডারউইন এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে স্তণ্যপায়ীদের ইতিহাসে নিশ্চয়ই এটি একটি চমৎকার ঘটনা, দক্ষিণ আমেরিকাতে তার নিজস্ব ঘোড়া ছিল, তা বিলুপ্ত হয়ে গেল, কিন্তু বহুকাল পরে স্পেনীয়দের আনা কয়েকটি ঘোড়ার বংশধর তাদের স্থান দখল করে নিল (৩)। এভাবেই ভৌগোলিকভাবে সংযুক্ত

এলাকাগুলোর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে একই প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদের অস্তিত্ব দেখা যায়। ঘোড়া যদি এশিয়া, ইউরোপে ছড়িয়ে না পড়ত বা তারা ছড়িয়ে পড়ার আগেই যদি উত্তর আমেরিকা এবং রাশিয়ার মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত (যা পরবর্তী সময়ে হয়েছে) তাহলে আজকে হয়তো পৃথিবীর বুকে আর ঘোড়ার অস্তিত্বই থাকত না!

বিবর্তন প্রক্রিয়া যদি সত্যিই প্রকৃতিতে কাজ করে থাকে তবে যে প্রাণী যত পরে অন্য প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়ে নতুন প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে, তার সাথে তার ঠিক আগের পূর্বপুরুষের শারীরিক পার্থক্য ততই কম হবে বলে আশা করা যায়। এ ক্ষেত্রে ঠিক তাই হয়েছে। বিভিন্ন প্রাণীর শারীরিক গঠনের মধ্যে এই সাদৃশ্য দেখেও ডারউইন বিস্মিত না হয়ে পারেননি। বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর সামনের হাত বা অগ্রপদের মধ্যে কি অস্বাভাবিক মিলই না দেখা যায়! ব্যাঙ, কুমীর, পাখি, বাদুর, ঘোড়া, গরু, তিমি মাছ এবং মানুষের অগ্রপদের গঠন প্রায় একই রকম। এখন আমরা আধুনিক জেনেটিক্স জ্ঞান থেকেও জানতে পারছি যে, এরকম বিভিন্ন প্রাণীর ডিএনএর মধ্যেও লক্ষণীয় রকমের মিল দেখা যায়। ডারউইনের সময় বিজ্ঞানীদের ডিএনএ বা জেনেটিক্স সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না, তিনি প্রাণীদের মধ্যে শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য দেখে অবাক হয়ে লেখেন, 'হাত দিয়ে মানুষ কোনও কিছু ধরে, আর ছুঁচো তা দিয়ে মাটি খুঁড়ে। ঘোড়ার পা, শুশুকের প্যাডেল ও বাদুরের পাখার কাজ ভিন্ন। অথচ এদের সবার হাত বা অগ্রপদের গঠন শুধু একই প্যাটার্নেরই নয়, তুলনামূলকভাবে একই জায়গায় আছে একই নামের অস্থিগুলো... এর থেকে অদ্ভুত আর কি হতে পারে?'(৩)।

বিবর্তনের আরেকটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হচ্ছে বিভিন্ন প্রাণীর শরীরে এখনও বিদ্যমান বিলুপ্ত প্রায় (Vestigeal Organs) এবং অপ্রয়োজনীয় অঙ্গগুলো। তিমি মাছের সমুদ্রে বাস করার জন্য পায়ের দরকার নেই, কিন্তু এখনও পেছনের পায়ের হাড়গুলো কেন রয়ে গেছে তার? সাপের পাঁচ পা হয়তো দেখা যায় না, কিন্তু কিছু সাপের শরীরে কেন এখনও রয়ে গেছে পায়ের হাড়ের অংশগুলো? উড়তে পারে না এমন অনেক পাখি, পোকা বা আরশোলার পাখা রয়ে গেছে, মানুষের তো লেজ থাকার কথা নয়, তাহলে লেজের হাড়ের অংশগুলো কি করছে আমাদের শরীরে? এপেনডিক্সের প্রয়োজন ঘাসসহ বিভিন্ন ধরনের সেলুলোজ-সমৃদ্ধ খাওয়া হজম করার জন্য, মানুষ তো ঘাস খায় না, তাহলে এ অঙ্গটির কি প্রয়োজন ছিল আমাদের? তারপরে ধরুন, আক্কেল দাঁত বা ছেলেদের শরীরের স্তনবৃন্ত–এগুলোরই বা কি দরকার? প্রকৃতিতে এমন ধরনের উদাহরণের কোনও শেষ নেই–বোঝাই যাচ্ছে যে,

এই বিলুপ্তপ্রায় অংগগুলো একসময় পূর্বপুরুষদের কাজে লাগলেও, এখন বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় পরিবর্তিত প্রাণীদের দেহে এরা আর কোনও কাজে আসে না।

তবে ডারউইন দীর্ঘকাল ধরে অব্যবহারের ফলে এই অঙ্গগুলো একসময় ছোট এবং অকেজো হয়ে পড়ে বলে যে ধারণা করেছিলেন পরবর্তী সময়ে বংশগতিবিদ্যার জ্ঞানের আলোকে তা ভুল বলে প্রমাণিত হয়। ডারউইনের সময় জেনেটিক্স বা বংশগতি সম্পর্কে তার নিজের এবং সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের কোনও ধারণা ছিল না, ফলে তিনি কয়েকটি ব্যাপারে সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, যদিও পরবর্তী সময়ে প্রমাণিত হয় যে বিবর্তন সম্পর্কে তার মূল ধারণার সবগুলোই প্রায় সঠিক ছিল। বিখ্যাত বিবর্তনবাদী Stephen Jay Gould এর ভাষায় "Odd arrangements and funny solutions are the proof of evolution-paths that a sensible God would never tread but that a natural process, constrained by history follows perforce" (Gould 1980; Gould in Pennock 2001, 670). এ ধরনের হাজারও উদাহরণ টেনে ডারউইন প্রমাণ করেন যে, এগুলো থেকে একদিকে যেমন বোঝা যায় আমাদের চারদিকের সৃষ্টিগুলোতে কি পরিমাণ খুঁত রয়ে গেছে, অন্যদিকে এটাও প্রমাণ হয় যে, আমাদেরকে আলাদা আলাদা করে কোনও সৃষ্টিকর্তার হাতে যত্নে সৃষ্টি করা হয়নি, আমরা এসেছি কোনও না কোনও পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে। তিনি তার প্রজাতির উৎপত্তি বইটিতে এত রকমের উদাহরণ দিয়ে তার বিবর্তনের তত্ত্ব প্রমাণ করেছিলেন যে, আজও তা বিস্ময়কর বলেই মনে হয়। বিবর্তনের মাধ্যমেই জীবের পরিবর্তন হতে হতে একসময় নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হচ্ছে, আর এই বিরামহীন পরিবর্তনই কাজ করে চলেছে আমাদের বেঁচে থাকার চাবিকাঠি হিসেবে। ডারউইন তার সময়ের থেকে এতখানিই অগ্রগামী ছিলেন যে, তার মতবাদকে সঠিক বলে প্রমাণ করতে আমাদের আরও অনেকগুলো দশক পার করে দিতে হয়েছিল। বিজ্ঞান যতই এগিয়েছে ততই গভীরভাবে প্রমাণিত হয়েছে তার তত্ত্বের যথার্থতা। বংশগতিবিদ্যা এবং ডিএনএর আলোকে বিবর্তনবাদের ব্যাখ্যা দেয়ার ইচ্ছা রইল আগামী কোনও একটি অধ্যায়ে।

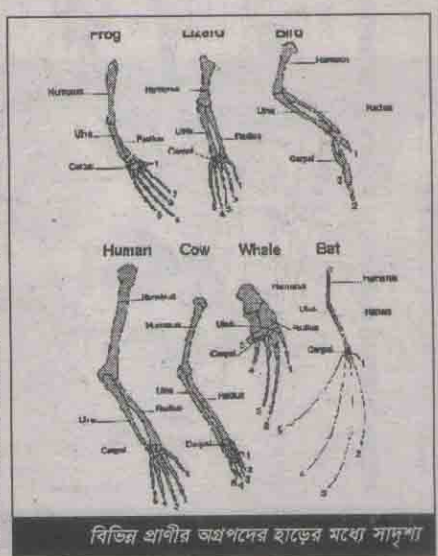

বিভিন্ন প্রাণীর অগ্রপদের হাড়ের মধ্যে সাদৃশ্য

আমরা আগেই দেখেছি যে, ডারউইন বীগেল জাহাজে ওঠার সময় জীবের স্থিতিশীলতার তত্ত্বে বিশ্বাসী একজন প্রকৃতিবিদ ছিলেন। ৫ বছর ধরে তিনি যতই বিভিন্ন দ্বীপে ঘুরলেন, খুব কাছ থেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে চারদিকের প্রকৃতি আর তার সৃষ্টিকে দেখলেন ততই তার সন্দেহ বাড়তে লাগল। আর তারই ফলশ্রুতিই আমরা পরবর্তী সময়ে পেলাম জীবের বিবর্তনের মতবাদ। বীগেল যাত্রা থেকে ফিরে আসার সময়ই তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সন্দেহ করতে শুরু করেন যে, জীবজগৎ স্থির নয়, বিবর্তনের ফলে এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির সৃষ্টি হয়ে আসছে অনাদিকাল থেকেই। কিন্তু তিনি খুব ভালভাবেই জানতেন যে, একথা আরও কয়েকজন প্রকৃতিবিদও বলেছেন তার আগে–তাদের সেই মতবাদ আদৌ ধোপে টেকেনি! তাই তিনি ১৯৩৬ সালে ইংল্যান্ডে ফিরে এসে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বিবর্তনের ধারণাটি শুধু প্রকাশ করলেই হবে না, কীভাবে ঘটে তা পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণসহ উপস্থাপন করতে না পারলে তার মতবাদকেও অন্যদের মতোই ইতিহাসের আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হবে। ঠিক করলেন গোপনে তার কাজ চালিয়ে যাবেন–আর তারপরই শুরু হলো সেই দীর্ঘ যাত্রা, প্রায় ২০ বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন তা শুধু ১৮৫৮ সালেই পৃথিবী জুড়ে হৈচৈ ফেলে দেয়নি আজও তার জের চলছে পুরোদমেই। আর এই ২০ বছরের সাধনার ফল থেকেই আমরা পেলাম ডারউইনের সেই যুগান্তকারী প্রস্তাব–প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমেই ঘটে চলেছে প্রাণের বিবর্তন–যা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনার জন্য তোলা রইল। **(চলবে)**

Reference

(1) http://www.ucmp.berkely.edu/history/linnaeus.html

(2) Ridley, Mark (2004), Evolution, BlackwellPublishing, Oxford, United Kingdom.

(৩) ড. ম আখতারুজ্জামান, (২০০২), বিবর্তনবাদ। হাসান বুক হাউস, ঢাকা, বাংলাদেশ।

(4) http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/02/4/1_024_01.html

(6) Dr. Berra, M. Tim (1990), Evolution and the Myth of Creationism. Stanford University Press, Stanford, California

(7) National Geographic Magazine, Was Darwin Wrong, November 2004 edition.

(৯) সুশান্ত মজুমদার, ২০০৩, চার্লস ডারউইন এবং বিবর্তনবাদ, প্রকাশক : সোমনাথ বল, কোলকাতা, ইন্ডিয়া।

(10) http://www.guardian.co.uk/life/feature/story/0,13026, 155974300.html